দ্বিতীয় অধ্যায়

তেভাগার সংগ্রাম : বাংলা উপন্যাস

বিগত দশকের চল্লিশের দশক– এই বিশেষ কালপর্বটি নানা কারণেই স্মরণীয়। এই দশকে বাঙালি সাখী থেকেছে নানা ঘটনা–দুর্ঘটনার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তীব্রতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, স্বাধীনতাপূর্ব ভারতবর্ষের সবথেকে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন তেভাগা আন্দোলন, দেশভাগ ও স্বাধীনতা। এই অজস্র ঘটনাবলী নানা স্বরূপে বাংলা উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠেছে। কারণ সময়ের ছাপ উপন্যাস তার গায়ে মেখে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ভাবনাকেই ব্যঞ্জিত করে তোলে। তেভাগা আন্দোলনকেন্দ্রিক উপন্যাস আমাদের গবেষণা কর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমুখ। ফলত এই অধ্যায়ে আমরা বাংলা উপন্যাসের বিষয় হিসেবে তেভাগা আন্দোলনের ভূমিকা ও গুরুত্বকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। তেভাগা আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় রচিত হয়েছে বেশ কিছু উপন্যাস। সব কটি উপন্যাসেই যে তেভাগা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি তা নয় বরং এই আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাবই বেশিরভাগ উপন্যাসের মূল অবলম্বন। কারণ প্রায় প্রতিটি উপন্যাসই রচিত হয়েছে আন্দোলন সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর। তবুও বলা যায় তেভাগা প্রথম বাংলার কৃষককে শুধু দাবি আদায়ের প্রশ্নে নয়, আত্মমর্যাদার প্রশ্নেও সচেতন করে তুলেছিল। আত্মসচেতন, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এক নতুন ভাবধারায় পুষ্ট কৃষক শ্রেণির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটল। আর এই আন্দোলনের উদ্দীপনায় রচিত উপন্যাসে সেই কৃষক শ্রেণিকে ব্যক্ত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে আন্দোলনের গুরুত্ব বিবেচনায় উপন্যাসের সংখ্যা অপ্রতুল, তবে তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

১. লখীন্দর দিগার : গুণময় মান্না

গুণময় মান্নার প্রথম উপন্যাস 'লখীন্দর দিগার' (১৯৫০ খ্রি:)। কৃষক এবং শ্রমিক জীবনের চিত্রণে তিনি আজীবন স্বচ্ছন্দ থেকেছেন। প্রত্যক্ষভাবে কোনো রাজনৈতিক দলে নাম না লেখালেও তিনি যে মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী তা কখনো অস্বীকার করেননি। জীবনের সামগ্রিক রূপায়ণে রাজনীতিকে বাদ দেওয়া যায় না। তাঁর সাহিত্যচর্চার মূলে নিহিত রয়েছে এই রাজনৈতিক বিশ্বাসেরই টুকরো টুকরো প্রতিচ্ছবি। তিনি নিজেই একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'তবে যদি কিছু রাজনৈতিক মতাদর্শ আমার লেখায় ছাপ ফেলে থাকে, তবে তা উক্ত মার্কসীয় দৃষ্টিরই ফসল। কিন্তু মার্ক্সীয় দৃষ্টি আর কম্যুনিস্ট পার্টি যদিও সম্পর্কিত, তবু ও – দুটো এক নয়। আমি কোনোদিনই পার্টির সদস্য ছিলাম না – না কংগ্রেস, না কম্যুনিস্ট। তবে একদা কিছু সময়ের জন্য ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য ছিলাম। পুলিশের খাতায় নাম ছিল, বাসগৃহ তল্লাসিও হয়েছিল। না, জেলে যাওয়ার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আমার হয়নি। কাউকে কোনো পার্টিকে সমর্থন অসমর্থনের প্রশ্ন নিশ্চয়ই আসে। তার উত্তরে একটা কথাই বলব – চিরকাল আমি এ্যান্টি এ্যাস্টাব্লিশমেন্ট ; সেটা বোধ করি সব বুদ্ধিজীবীর স্বভাব, অসাধারণ কিছু নয়'।[১] এই প্রতিষ্ঠান বিরোধীতাকেই তিনি আজীবন লালন করে এসেছেন। তাই প্রথম উপন্যাসের নায়ক কৃষক লখীন্দর প্রতিষ্ঠিত সরকারি নীতির বিরুদ্ধেই লড়াই করে। এই উপন্যাসের সূত্রপাত স্বাধীনতার পরে। উপন্যাস শুরুই হচ্ছে সময়কালকে চিহ্নিত করে 'তেরশো পঞ্চান্ন সালের সতেরোই অগ্রহায়ণ সকাল বেলা'।[২] সুতরাং এই উপন্যাস তেভাগা আন্দোলন ঘটে যাওয়ার পরবর্তীকালের পটভূমিকাকে কেন্দ্র করে রচিত। স্বাভাবিকভাবেই এটা স্বীকৃত তেভাগা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব এই উপন্যাসে নেই। কিন্তু তেভাগা কৃষক মনে যে পরিবর্তনের ইঙ্গিত জাগিয়েছিল তার স্পষ্ট প্রভাব এই উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে বর্ণিত হয়েছে। একটি আন্দোলন নির্দিষ্ট কালপর্বে সংঘটিত হয় ঠিকই কিন্তু তার প্রভাব রয়ে যায় পরবর্তীকালে। যে কোনো আন্দোলনই তার পূর্ববর্তী ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে সংঘটিত হতে

পারে না। তেভাগা কৃষক মনে যে পরিবর্তনের ইঙ্গিত জাগিয়েছিল তা পরবর্তী কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তা আমরা আমাদের এই গবেষণাকর্মে বারবারই লক্ষ্য করব। স্বাধীনতা লাভের পর কৃষক মনে করেছিল বিদেশী শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে এবার তারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল শুধু শাসকের মুখগুলি পরিবর্তিত হয়েছে শোষণের কোনো পরিবর্তন হয়নি। স্বাধীনতার পর ক্ষমতাসীন দল একের পর এক উন্নয়নশীল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ঠিকই , কিন্তু তার ফলশ্রুতি কৃষকদের কাছে পৌঁছয়নি। সেগুলি শুধুমাত্র ক্ষমতা দখলের এক একটি মাধ্যম রূপেই রয়ে গেছে। এই প্রেক্ষাপটেই রচিত এই উপন্যাসটি। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র লখীন্দর দিগার। একান্ন বছর বয়স তার। জীবনটা সে দেখেছে অনেকটাই। উপলব্ধি করেছে জীবনের উদ্দেশ্যই হল সবার সাথে মিলেমিশে থাকা। সবার আপদে বিপদে বারবার সে এগিয়ে এসেছে। কোনো অন্যায়কে সে কখনোই প্রশ্রয় দেয়নি। নিজের মতন করে তার প্রতিবাদ করেছে। তার মনে হয়েছে মানুষের উপকার করার মতো আনন্দ আর অন্য কিছুতেই পাওয়া যায় না। গুণময় মান্নার বাসস্থান মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল। আর এই উপন্যাসের পটভূমিকাও মেদিনীপুরের শ্যাওড়া, শ্যামগঞ্জ, ধানগাছিয়া, শীরষা, কেঁচকাপুর, কেশপুর, ঝাঁকড়া প্রভৃতি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে। এই উপন্যাসের কৃষকেরা কিন্তু বেশ সচেতন। কারণটা হল তেভাগা আন্দোলনের ফলশ্রুতি। উপন্যাসে অনেকবারই পূর্ববর্তী তেভাগা আন্দোলনের গৌরবজনক অধ্যায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে কৃষকনেতা গোবিন্দ মিত্তির। গোবিন্দ কৃষকসভার নেতা। আর গোবিন্দর নির্দেশে এই অঞ্চলের সমস্ত কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার কাজ করে সতীশ। সতীশ ফেরারী কৃষক এবং শিক্ষিত। তার সম্বন্ধে অশিক্ষিত কৃষকদের মধ্যে একটি সংশয় কাজ করে। তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় এই শিক্ষিত নেতারা গ্রামে এসে মানুষদের নানা উন্নয়নের কথা বলে মাতিয়ে তোলে পরে কাজ গুছিয়ে পালিয়ে যায়। কারণ স্বাধীনতার পর প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই কৃষকদের অধিকারকে সুনিশ্চিত করার জন্য অনেক ইস্তাহার প্রকাশ করেছেন, কিন্তু বাস্তবে তার ফল কৃষক পায়নি।

লখীন্দর একথা জানে। তবুও সতীশ সম্বন্ধে তার অগাধ বিশ্বাস। সে বলে – 'চাষীরা লড়ে দেখেনি এমন লয়, গুলি গোলাও চলেছে, মানুষ মরেওছে, কিন্তু আজ ই গেল ত সে এল। সে একদিন গেল ত আর একজন ই শালা এই রকমই চলছে। তবে ...ওরা আমাদিকে মাতি দেয়, আর নিজেরা পালি যায়, তা ঠিক লয়। পিথিবীতে অনেক রকম মানুষ আছে, ভাই, ঠগও পাবে সাচ্চাও পাবে'।[৩]

সতীশকে যেহেতু সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করতে পারে না গ্রামের মানুষ তাই তার আহ্বানে মানুষ জোটবদ্ধ হতে চায় অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে। সতীশ বোঝাতে চায় নিজের জিনিস বুঝে না নিলে কেউ হাতে তুলে দেবে না। কৃষকের কাছে কৃষি একটি সংস্কৃতি, তার অস্তিত্বের অংশ। তাই জমিদারের অন্যায় কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। লখীন্দর উপলব্ধি করে সময় দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। একদিকে যেমন কৃষকের জমির প্রতি রয়েছে গভীর টান, অন্যদিকে অনেকেই আর পূর্বপুরুষের কাজের উপর ভরসা রাখতে পারছে না। সমাজ পাল্টে যাচ্ছে। মানুষ তাড়াতাড়ি বেশি পয়সার মালিক হতে চাইছে। সেই কারণে যে কোনো পথই তারা অবলম্বন করতে চাইছে। 'আগে মানুষ সুখী ছিল। এখন দুহাতে পয়সা লুটছে, কিন্তু আনন্দ নাই। ... আজকাল জাত – ব্যবসা করে কেউ! শালা বামুন বলে, রইল তোমার পূজা – আচ্চা, শহরে যেয়ে জুতার দোকান ফাঁদল। চাষা বলছে, ল্যাঙলের বোঁটা ধরবনি আর।'[৪] এই পরিবর্তনটাকে অনুভব করতে চায় লখীন্দর। মানুষের প্রতি তার অসীম মমতা। তার ছেলে সুধীর বাবার এই পরোপকারী মনোভাব মেনে নিতে পারে না। তাকে অন্য কারোর বিষয়ে মাথা গলাতে সে বারণ করে। লখীন্দর তার ছেলের কথা মানতে পারে না। সে পূজারী কৃষ্ণমোহন ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনা করে। বিনয়ী এই মানুষটি বিয়াল্লিশের কংগ্রেসী আন্দোলনের সময় এই গ্রামে এসেছিলেন। সবাইকে তার প্রাপ্য সম্মান তিনি দিতে জানেন। ছোট বড় ভেদাভেদ ভুলে তিনি সবার আপদে বিপদে পাশে দাঁড়ান। কৃষ্ণমোহন লখীন্দরের বড় সহায়। তার কাছে এলে মনের সমস্ত প্রশ্নের সমাধান লখীন্দর পায়। সমাজের নীতি –

দুর্নীতি কিভাবে সাধারণ মানুষকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে তা নিয়ে তাদের আলোচনা হয়। লখীন্দর যে একজন খুব বড় মনের মানুষ, সবার প্রতিই যে তার তীব্র মমত্ব সে বিষয়ে কৃষ্ণমোহনের কোনো সংশয় নেই। তাই তিনি বলেন,'তোমার হৃদয় খুব বড়, লখীন্দর। এমন কথা তো কেউ বলে না। তুমি ঠিকই বলেছ লখীন্দর মানুষ ছোট হয়ে গেছে, আর এই পুলিস, চৌকিদার, সরকার সুবেদার এরা মানুষকে ছোট করে দিচ্ছে, তাকে মাথা তুলতে দিচ্ছে না'।[৫]

স্বাধীন দেশে এখন পুলিস – প্রশাসন সাধারণ মানুষের উপর নির্মম অত্যাচার করছে। গ্রামের অভাবী কৃষক রামের স্ত্রীকে গণধর্ষণ করেছে পুলিস। কি নিষ্ঠুর এই সমাজ। তবুও রাম তার স্ত্রীকে ত্যাগ করেনি বলে গ্রামের মানুষ নানাভাবেই রামকে বিব্রত করছে। এই আমাদের মনুষ্যত্ব, আমাদের মানবিকতার পরিণতি। আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর মানুষের এই স্বরূপ লখীন্দরকে গভীর যন্ত্রণায় দগ্ধ করে। দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু করে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে লখীন্দর। বুঝতে পারে সর্বত্র চলছে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার। পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিতে যে কোনো মানুষকে দমিয়ে রাখার এক ভয়ঙ্কর প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কৌশলী ধুরন্ধর রাজনীতিবিদরা মানুষের লোভকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। কৃষ্ণমোহন ঠাকুরের কথায় বিষয়টা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে লখীন্দরের ' লোভ হলে মানুষ হয় পরনির্ভর, নিজের ওপর আর আস্থা থাকে না। তখন শুধু ভিক্ষে করে মানুষ, আজ ইস্কুল দাও কাল জলের কল দাও, পরশু রাস্তা মেরামত করে দাও ...এতে কে ছোট হয়, মানুষ নিজেই ছোট হচ্ছে' ।[৬] কেন এমন হল ? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চায় লখীন্দর। সে বোঝে যন্ত্রের উপর নির্ভরশীল মানুষ আজও নিজেই যন্ত্রে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো তো পাপ। তাই নতুন উদ্যমে লখীন্দর অপমানিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে চায়। কৃষিজীবী মানুষের কাছে নিজের জমির উপর থেকে অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার মত অপমান তো আর কিছুতেই নেই। তাই জমিদার লেঠেল বাহিনী আর পুলিস পাঠিয়ে যেদিন মনু দিগারের জমির ধান তুলে নিতে এলো, সেদিন আর লখীন্দরের পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব

হল না। সব চাষিরা জোটবদ্ধ হয়ে জমিদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এই অন্যায়ের আজও যদি প্রতিবাদ না করা হয় তবে একে একে সবার উপরেই এই আঘাত নেমে আসবে। তাই লখীন্দর বলে ,'ধান আমরা দুবনি। তাতে যা হয় হউ'।[৭] বিপদকে ভয় করলে চলবে না। কৃষকের কাছে তার জমির ধানের তুল্য মূল্যবান আর কিছুই নেই। সে কৃষকদের আশ্বস্ত করে এই বলে এক সঙ্গে থাকলে কারোর ক্ষমতা নেই তাদের দমন করে।'পুরুষের বাচ্চার ভয় নাই। আমরা গাঁয়ে যাচ্ছি ধান রাখতে, আবার ফিরে আসব, বউ এর আঁচল ধরে কোণে লুকাবনি!'[৮] জমিদারও চুপ করে বসে থাকে না, প্রত্যাঘাত করে। জমিদারের পাঠানো লেঠেল বাহিনীর লাঠির ঘায়ে অজ্ঞান হয়ে যায় লখীন্দর। আঘাতপ্রাপ্ত হয়েও লখীন্দর কৃষকদের বোঝায়, এই সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। মাথা গরম করে কোনো কাজ উদ্ধার হবে না। লোভ করলেও হবে না। কারণ জমিদার হয়তো লোভ দেখিয়ে দল ভাঙিয়ে নিতে পারে। ঝাঁকরার কৃষক নেতা গোবিন্দই যে কৃষকদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে তা জমিদার অজয় জানে। তাই গোবিন্দকে সে শেষ করে দিতে চায়। এই কাজে তার সহচর তারই মামাশ্বশুর হরি চৌধুরী। গোবিন্দকে তার স্ত্রীর হত্যার মিথ্যা অপরাধে ফাঁসিয়ে দেয় হরি। আসলে খুনটা তারাই করিয়েছিল। গোবিন্দর স্ত্রী গায়ত্রীকে কুমারী অবস্থায় নষ্ট করেছিল হরি। গায়ত্রী ছিল অজয়ের স্ত্রী সাবিত্রীর সম্পর্কের বোন। সব জেনেও অজয় হরির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বরং গোবিন্দের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কৃষক সমিতির সমস্ত গোপন খবর তার থেকে আদায় করত। এই অন্যায় গোবিন্দ জেনে যাওয়ার পর তাকে হত্যা করে হরিরা। আর অপবাদ চাপিয়ে দেয় গোবিন্দের উপর। গোবিন্দ কোনো প্রতিবাদ করে না। কারণ তার মনে হয়েছিল এই বিশ্বাসঘাতিনীর মৃত্যুর মিথ্যা অপবাদ তার মাথায় থাকলে অন্তত সে বোঝাতে পারবে অন্যায়ের সঙ্গে সে কোনো আপস করে না। লখীন্দর গোবিন্দর এই দুর্নামের কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। কারণ তার মনে হয় গোবিন্দই তাকে অনুপ্রাণিত করেছে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। সমাজটাকে বদলানোর কথা গোবিন্দই বারবার করে বলে। গতবারের তেভাগার কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলে, 'আমাদের সাবধান হতে হবে। তৈরী থাকতে হবে। একটা কথা শুধু

আমাদের, ধান আমরা ছাড়ব না, ধান ছাড়ব না'।[৯] কৃষক সমিতির গোপন মিটিং – এ লখীন্দরকে আপনি সম্বোধন করে মনু দিগারের জমির ধান রক্ষা করার বিষয়ে কিছু সে বলতে বলে। এই আপনি সম্বোধনটি বড় ভালো লাগে লখীন্দরের। আমরা লক্ষ্য করেছি তেভাগা আন্দোলন কৃষকদের সমস্ত দাবিকে মেটাতে পারেনি। কিন্তু কৃষকের মর্যাদার প্রশ্নে এই আন্দোলন একটি অন্য মাত্রা যুক্ত করেছিল। কৃষক তার আত্মসম্মানের প্রশ্নে একটি নতুন অবস্থান লাভ করেছিল। লখীন্দরের মনে হয় – ব্যাপারটা হয়তো কিছু নয়, কিন্তু তারাও যে মানুষ, এই সত্যটা স্বীকার করার সময় উপস্থিত হয়েছে। একজন সাধারণ কৃষকের সামাজিক সম্মানের মূল্যকে যে স্বীকৃতি দেওয়া উচিৎ, তা নতুন করে লখীন্দরের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল। গোবিন্দ লখীন্দরকে পড়াশোনা করতে বলে। তাহলেই অশিক্ষিত লখীন্দর এই সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাসকে অনুভব করতে পারবে। তার একটি অত্যন্ত সহৃদয়, মমতাময় মন আছে। সমাজের প্রতিটি মানুষের প্রতি তার অপার করুণা। এই অনুভূতিপ্রবণ, দরদী মনটিই পারে মানুষের জন্য কাজ করতে। সতীশ বই ও পত্রিকা থেকে লখীন্দরকে দিনবদলের ইতিহাস পড়ে শোনায়। এই পাঠ থেকে সে উপলব্ধি করে, 'সাধারণ মানুষের ইজ্জতের লড়াই শুধু তো এই ঝাঁকড়া – কেশপুর – তমলুকে সীমাবদ্ধ নয়। এই লড়াই চলেছে সব জায়গায় : বাংলায়, ভারতবর্ষে – পৃথিবীর সবখানে।'[১০]

নতুন করে লড়াইয়ের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে লখীন্দর। ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলন ঘটেছিল। তার ভিত্তি ছিল সরকারের কুখ্যাত খাদ্যনীতি। সেই আন্দোলনের পিছনে দীর্ঘদিনের যে অন্যায়টা ছিল তা এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক উপস্থাপিত করেছেন। সরকারের বেঁধে দেওয়া ধানের দাম অত্যন্ত কম থাকায় কৃষকদের মনে অসন্তোষ ঘনীভূত হতে থাকে। সরকারি কর্মচারিদের ঔদ্ধত্য এবং দুর্নীতি একশো মন ধানকে, একশো পঁচিশ মন করে ধরে দাম কম দেওয়ার চক্রান্ত কৃষকদের প্রতিরোধে বাধ্য করায়। গ্রামে পোস্টার পড়ে – ' জান দিব তবু ধান দিব না'। সরকারের নির্দেশ অমান্য করার জন্য শীরষে গ্রামে সংঘর্ষ বাধে। লখীন্দরের

ছেলে সুধীর এই লড়াইতে নাম লিখিয়ে ধরা পড়ে। অনেকের মৃত্যুও ঘটে। জমিদাররা পুলিসের সাহায্যে বহু কৃষককে গ্রেপ্তার করায়। গ্রাম জনশূন্য হয়ে যায়। পলাতক আসামীদের নাম জানালে পুরস্কার দেওয়া হবে একথাও বলা হয়। তবুও নেতাদের কেউ ধরিয়ে দেয় না। গোবিন্দ কৃষকসভার উদ্দেশ্যকে সবার সামনে স্পষ্ট করে তোলার জন্য ছাব্বিশে জানুয়ারি পালন করার কথা ঘোষণা করে। লখীন্দর ভাবে এইভাবেই হয়তো চাষার মুখে হাসি ফুটবে। কৃষকের স্ত্রী কাপড় পাবে, চুড়ি পাবে। কিন্তু গোবিন্দ লখীন্দরের ভুল ভাঙিয়ে দেয়। সে বলে, 'আমি তো সুখ দিতে পারব না। আমি স্বাধীনতার আস্বাদ দিতে পারি। কিন্তু তাতে কষ্ট আছে। ...আমাদের কথা আমরা মুখ ফুটে বলতে পারিনে, তার স্বাধীনতা চাই। আমাদের ভাগ্য আমরা নিয়ন্ত্রণ করব তার স্বাধীনতা চাই। চাই, মানে কারো কাছে ভিক্ষে করে নয়। সেটা আমরা সৃষ্টি করে তুলব'।[১১]

ছাব্বিশে জানুয়ারি পালিত হয়। অনেক দূর দূর থেকে মানুষ আসে। লখীন্দরের কথায় মানুষের প্রতি সহমর্মিতাই বর্ষিত হয়। সে বলে , " সতীশ ভাই বলল, আমাদের সব জিনিস আমরা দেখব। ই অতি উত্তম কথা। আমাদের ধান আমরা দেখব বই কি।' আমাদের মান ইজ্জৎ ভাল-মন্দ আমাদিকে দেখতে হবে। কিন্তু ভাই, আমার ক্ষুদ্দ বুদ্ধিতে এই লেয়, যে ও তে অহংকার করলে চলবেনি। লোভ করলে চলবেনি। সবই আমরা করলম, তবু আমরা করলম এই কথা বললে চলবেনি।"[১২] রাজনৈতিক সুবিধাবাদের ইতিহাসে রাজনৈতিক নেতাদের এই আত্মগর্বী মনোভাবের সঙ্গে আমরা পরিচিত। লখীন্দর কিন্তু তার তথাকথিত প্রাতিষ্ঠানিক অশিক্ষা নিয়েও জীবনের সারকথাটি উপলব্ধি করেছে যে মানুষকে ভালোবাসতেই হবে। ঘৃণা আর হিংসার কোনো স্থান নেই এই জীবনে। গোবিন্দ এসে খবর দেয়, অন্তরীণ আদেশ সে ভঙ্গ করেছে,তাই পুলিস লখীন্দরকে গ্রেপ্তার করবে। জেলে তার উপর অত্যাচার করা হবে বলে সতর্কও করে দেয় গোবিন্দ। কিন্তু লখীন্দর বলে , 'একথা কেনে বলছ ভাই। আমার কী মিত্যু – ভয় আর আছে? মিত্যু মাহা শান্তি, মাহা পরিণাম।'[১৩] লখীন্দরের সংস্পর্শে এসে

গোবিন্দও অনুভব করে, 'আমাদের শক্তি যে অপরাজেয় তা আগে বুদ্ধি দিয়ে জেনেছিলুম, আজও হৃদয় দিয়ে অনুভব করছি।'[১৪] পরেরদিন গ্রেপ্তার হয় লখীন্দর। উপন্যাস এখানেই শেষ হয়। কিন্তু পাঠকের মনে রয়ে যায় এমন এক কৃষক নেতা যে অভিজ্ঞতা আর মানুষের প্রতি অপার ভালবাসাকে সম্বল করে একটু একটু করে নিজেকে গড়ে তুলেছে। প্রতিরোধ তো শুধু বাহ্যিক নয়। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয় নিজের মধ্যেও লোভ থেকে, ঈর্ষা থেকে, বিদ্বেষ থেকে,হিংসা থেকে। আর সেই আন্দোলনটা বড় কঠিন। ঔপন্যাসিক আমাদের এই উপন্যাসে কৃষক আন্দোলনের পাশাপাশি সেই আন্দোলনের পাঠও দিয়েছেন। আর সেখানেই তিনি তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

২. লালমাটি : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আমরা এখন যে উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লালমাটি' (১৯৫১ খ্রি:)। এখানেও তেভাগা প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে অনুপস্থিত। কিন্তু তেভাগা–র অনুভব উপন্যাসটির সামগ্রিক চেতনায় নিহিত হয়ে রয়েছে। যে বরেন্দ্রভূমির লালমাটি ছিল ছিল কৈবর্ত বিদ্রোহের নীরব সাখী সেখানেই ঘটেছে কৈবর্ত বিদ্রোহের নবজন্ম। কমিউনিস্ট কর্মী রঞ্জন শোষিত আদিবাসী সাঁওতাল কৃষক ও খেতমজুরদের সংগঠিত করতে চায়। হিন্দু ও মুসলমানের রাজনৈতিক বিরোধ এবং জমিদারের শোষণের নগ্নরূপের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে নতুন একটি ভোরের সূচনা করতে চায়। কালাপুখরি এবং আশেপাশের আরো প্রায় ছোট–বড় পনেরোখানা গ্রাম নিয়ে তুরীদের এলাকা। এই গ্রামগুলির দুপাশে দুহাজার বিঘে ধানী জমি। আর এই মাঠের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে একটি সরু খাল যাকে বলা হয় কামারহাটির ডাঁড়া। প্রাকৃতিক কারণেই ডাড়াঁর মধ্য দিয়েই নদী এখন নতুন পথ কেটে নিতে চাইছে। ফলে ডাঁড়ার সংকীর্ণ খাতে জল আর ধরছে না, দুকূল ছাপিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে। ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দুই পাশের হাজার হাজার বিঘার ফসল। কিন্তু

জলকরের লোভে জমিদার ভৈরব নারায়ণ এই ডাঁড়ার মুখ বন্ধ করতে রাজী নন। কৃষকেরা সংঘবদ্ধ হয়। তারা ফসল ফলানোর জন্য এবার মরিয়া হয়ে উঠেছে। কৃষক সমিতির মিটিং – এর মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই সভায় এসেছে পালগ্রামের সাঁওতাল, কালাপুখরির ওঁরাও থেকে শুরু করে সাধারণ কৃষকেরাও। বড় কৃষক ও বর্গাদাররাও এসেছে। রঞ্জন সেই সভায় বক্তৃতা দেয় – "... নদীর বন্যায় কালাপুখরি অঞ্চলের হাজার হাজার বিঘে ধানী জমি প্রতি বছর কীভাবে বরবাদ হয়ে যায়। আর জমিদারের কিছু জলকর বাঁচাবার জন্য নষ্ট হয় হাজার লোকের মুখের গ্রাস। তাই এবার বর্ষা নামবার আগেই বাঁধ দেওয়া হবে কালাপুখরির ডাঁড়ায়। কিন্তু তাতে জমিদারের বাধা। এই বাধা সয়ে এমন করে কিছুতেই আপনারা মরতে পারেন না। এবার রুখে দাঁড়াতে হবে আপনাদের–সকলে হাতে হাত মিলিয়ে বাঁধ বাঁধতে হবে। হয়তো জমিদারের লাঠিয়াল আসবে–পুলিশও আসতে পারে। কিন্তু সেই জন্যে আপনারা পিছিয়ে যাবেন কিনা সে বিচারের ভার আপনাদের ওপর।"[১৫]

'জান কবুল' করার সংঘবদ্ধ ঘোষণার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রত্যয়ী কৃষকের দল একটি নতুন লড়াই–এর জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু সংশয় তো থেকেই যায়। শুধু নিজেকে ভালো রাখার আকাঙ্ক্ষা তো মানুষের মজ্জাগত। তাই প্রশ্ন ওঠে – 'কালাপুখরিতে ঝামেলা হচ্ছে তা হচ্ছে। সেইটা লিয়া ওইখানকার মানসিলাই লড়িবে। হামরা ক্যানে ঝুটমুট ওইঠে যাই ফ্যাচাঙে পড়িমু।'[১৬] রঞ্জন এর উত্তর দেয়। মানুষকে বোঝাতে চায়–আজ দিন বদলে গেছে। অন্যের জন্যই আজ লড়াই করতে হবে। কারণ পৃথিবীর সমস্ত মানুষের শোষণের ইতিবৃত্তটা এক। তাই দুনিয়ার সমস্ত দুঃখী মানুষকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নিজেদের অধিকার কেড়ে নিতে হবে। 'যতদিন আপনারা ফারাক হয়েছিলেন, ততদিন আপনাদের ক্ষেতের ফসল লুটে নিয়েছে জমিদার, ঘরবাড়ি, গোরু–হাল নীলামে তুলেছে মহাজন। আজ যে যেখানে আছেন, যদি এককাট্টা হয়ে দাঁড়ান তাহলে দেখবেন দুদিনেই সব জুলুমবাজি বন্ধ হয়ে গেছে। রামের স্বার্থ

রাখবার জন্য যদি রহিম দাঁড়ায়, আলিকে বাঁচবার জন্য যদি ছুটে যায় – তাহলে সবাই বুঝতে পারবে তামাম পৃথিবীর ভুখা মানুষেরা আজ একদলে।'[১৭] এই বিপ্লবী সংগ্রামের উদ্দীপ্ত আশাবাদ এক নতুন শক্তিকে উদ্বোধিত করে তুলল। এক নতুন পরিবর্তনের হাওয়ায় উপলব্ধ হওয়া গেল। আসলে বড়লোকেদের কোন জাত নেই। শোষণের ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানী আর পাকিস্তানী সবই সমান। মানুষের রক্তস্রোতের ধারায় গড়ে উঠল বাঁধ। নতুন করে প্রতিরোধের মূর্ত স্বরূপকেই শাশ্বত করে রাখতে হবে। সমস্ত ভাঙা স্বপ্নগুলোকে জোড়া লাগাতে হবে। তাই চেষ্টাটা চালিয়ে যেতে হবে। সেখানে কোনো ফাঁক বা ফাঁকির অবকাশ নেই। আগামী দিনের ইতিহাসতো এই লড়াইয়ের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে।

৩. পাকাধানের গান : সাবিত্রী রায়

তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিকায় সাবিত্রী রায়ের 'পাকা ধানের গান' একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস। তিনখণ্ডে সমাপ্ত এই উপন্যাসটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৬ খ্রি:, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৫৭ খ্রি: এবং তৃতীয় খণ্ড ১৯৫৮ খ্রি:। নিরন্ন দরিদ্র মানুষগুলির জীবনের দুঃখবেদনা, দারিদ্র্য, শোষণ, বঞ্চনার দিনযাপনের বাস্তব কাহিনিকে কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সার্থক করে তোলার ক্ষেত্রে 'পাকা ধানের গান' নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা।

উপন্যাস শুরু হয়েছে তিরিশের দশকের উত্তাল রাজনৈতিক টানাপোড়েনের যুগে আর শেষ হয়েছে গারো পাহাড়ের হাজং – দের সঙ্গে তেভাগার লড়াইকে বাস্তবায়িত করার মধ্য দিয়ে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শ্রমিক মালিক বিরোধ, জোতদারের অত্যাচার, পুলিসি উৎপীড়ন, ক্ষমতা ও অধিকারের লড়াই–এর চির পরিচিত যে রূপ বিপন্নতা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল সেই সংকটের চিত্র এই উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়। কৃষক পরিবারের শিক্ষিত মেধাবী ছেলে পার্থ দাস কমিউনিস্ট ভাবধারায় উদ্দীপিত হয়ে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত হয়।

কৃষক শ্রেণিকে সংগঠিত করা তার দায়িত্ব। পার্থ উদ্বোধিত করতে চায় – 'হ্যাঁ, জমিদাররা এদেশের মানুষ ঠিকই। তবে তারা আমাদের মিত্র নয়। জমিদার আর কৃষক দুটো জাত। তাদের মধ্যে সম্পর্ক হল সাপ আর বেজির। শুধু এদেশে নয় – সারা দুনিয়ায়। রাশিয়া আজ জমিদারদের সরাতে পেরেছে বলেই কৃষকদের এতো উন্নতি। রাশিয়ার কৃষকদের কথা তোমরা হয়তো এখনও কিছুই জানো না। আমাদের মতই জমিদার দ্বারা তারাও এমনিভাবে অত্যাচারিত হতো। এমনি অনাহারে, অর্ধাহারে অজ্ঞতার অন্ধকারে তাদের দিন কাটতো। কিন্তু আজ তাদের গল্প শুনলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে। সেখানে এখন চাষীদের মধ্যে নিরক্ষরতা, অজ্ঞানতা, ব্যাধি, দারিদ্র্যের যন্ত্রণার পরিবর্তে এসেছে সুন্দর, সুস্থ জীবনের আনন্দ সুখ।'[১৮]এই সংগ্রামী চেতনার পাশাপাশি উপন্যাসে পার্থের মাস্টারমশাই দীনবন্ধু ও তার কন্যা দেবকীর কাহিনিও প্রথম খণ্ডের অনেকটা স্থান জুড়েই আছে। পুলিসের হাত থেকে আত্মগোপন করার লক্ষ্যে পার্থ মাস্টারমশাই দীনবন্ধুর বাড়িতে একরাত্রি আশ্রয় নেয়। সেখানেই দেবকীর সঙ্গে আলাপ হয়। দেবকীর পড়াশোনার আগ্রহ দেখে তাকে সদরের বিদ্যালয়ে পড়ার ব্যবস্থা করে দেয় পার্থ। দেবকী মনে মনে পার্থর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। পার্থ তাকে আগ্নেয়াস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়। কিন্তু দেবকীর পড়াশোনা অর্ধপথেই থেমে যায়। দেবকীর বিয়ে হয়ে যায়।

অন্যদিকে পার্থদের গ্রামে জমিদারের বসানো পথকরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য পার্থর ভগ্নিপতি লক্ষণ সহ কয়েকজনকে নির্মম প্রহার সহ্য করতে হয়। কংগ্রেসী নেতা প্রিয়তোষবাবু জমিদারের সঙ্গে গোপন আপোষ করে চাষিদের সাথে একটা মীমাংসায় আসতে চান। সাঁকো মেরামতের জন্য জমিদার অর্ধেক টাকা দিতে রাজি হন, কিন্তু পথকর দেওয়ার শর্তে। সমস্ত আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যায়। এই পর্বেই পার্থ ধরা পড়ে যায়, তার তিনবছরের সাজা হয়। বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সে কলকাতায় যায়। পার্টির নির্দেশক্রমে কৃষক আন্দোলনকে জনমানসে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য 'চাষি' পত্রিকা প্রকাশ করার দায়িত্ব সে পায়, কলকাতায় তার ফ্ল্যাটের মালিকের বিধবা পুত্রবধূ হিন্দি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ভদ্রার সঙ্গে তার

একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। 'চাষি'-র বাংলা সংবাদগুলো হিন্দিতে অনুবাদ করার জন্য সে ভদ্রার সাহায্য নেয়। পার্থর নতুন দায়িত্ব আসে কৃষক আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য পাহাড়পুরে যাওয়ার। পার্থকে চিঠি লেখার অপরাধে দেবকী শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়। এখানেই প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি হয়।

দ্বিতীয় খণ্ডে পার্থ কৃষক আন্দোলনে সামিল হয়। জমিদারের নায়েব হাজং-দের শাসিয়েছে, গতবারের ধারের ধান শোধ না হলে নতুন ধার পাবে না। কিন্তু তারা এই টংক প্রথা মানতে রাজি নয়। তারা চায় জমির অধিকার। জমিদার এতে রাজি নয়। উপরন্তু তারা জঙ্গলে ঢুকে কাঠ কাটার উপরেও নিষেধাজ্ঞা চাপায়। সশস্ত্র পাহারা বসায়। খামারে ধান পৌঁছানোর জন্য সাতদিন সময় বেঁধে দেয়। আর এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে হাজংরা। জমিদার ধান কেড়ে নিতে এলে আদিবাসীরা রুখে দাঁড়ায়। রক্তে রাঙা হয়ে যায় জমি। কৃষকরা সংঘবদ্ধ হয়। প্রতিজ্ঞা করে জান থাকতে ধান দেবে না। আদিবাসী ভূমিপুত্র সারথি-ঘনশ্যাম-শঙ্খমানরা অস্তিত্বের লড়াই লড়তে চায়। এটা অধিকারের লড়াই। ক্ষমতা দখলের লড়াইতে জমিদারও পিছিয়ে থাকে না। পুরোনো বর্গাদারদের জমি বিলি করতে থাকে। সুলক্ষণ, পার্থ চাষিদের সতর্ক করে দেয় তারা যেন ধান না ছাড়ে। নাহলে মজুতদাররা পরবর্তীকালে এর দাম দ্বিগুণ – তিনগুণ করে দেবে। সারা ভারতবর্ষব্যাপী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। গান্ধীজী গ্রেফতার হন। সারা ভারতে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। পার্থও 'বেআইনী বক্তৃতা' দিতে গিয়ে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে। ভদ্রা পার্থদের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। আলিপুর জেল থেকে পার্থর ছাড়া পাওয়ার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় পর্ব শেষ হয়।

শুরু হয় তৃতীয় পর্ব। এই পর্বে আন্দোলন তার কাঙ্ক্ষিত গতিপথ খুঁজে পায়। পার্থ কৃষকদের বক্তৃতা দিয়ে সংগঠিত করতে চায়। জমির প্রকৃত মালিক কৃষক। সময় উপস্থিত হয়েছে মজুতদারদের সমস্ত চক্রান্তকে নস্যাৎ করে নিজেদের খোলানে ধান তোলার। এইভাবে গারো অঞ্চলে তেভাগার লড়াই শুরু হয়। সারারাত আগুন জ্বালিয়ে ঢাক ঢোল করতাল বাজিয়ে

পাহাড়ি বুনো হাতির দলকে ফিরিয়ে দিতে সমর্থ হয়। কৃষক সমিতি এরপর দ্রুত ধান কেটে গোলায় তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ 'বুনো হাতির হাত থেকে ধান রক্ষা পেল। এবার জমিদারের পোষা হাতি আসার আগেই ধান কেটে ঘরে তুলতে হবে।'[১৯] মাঝরাতে হাজারখানেক কৃষক ''চাষীর মরা গাঙে আইল এবার বান রে, আইল এবার বান' গাইতে গাইতে একরের পর একর জমির ধান কেটে শেষ করে।''[২০] জমিদার কৃষককে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে কাজে লাগায়। আন্দোলন দমনে গাঁয়ে পুলিসের সাথে সেনাবাহিনী নামানো হয়। সেনাবাহিনীর গুলি পার্থর গায়ে লাগে। - ''সঙ্গে সঙ্গে টের পায় পার্থ তার গায়ের শার্টটাও রক্তে ভিজে গেছে। তাকিয়ে দেখে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে তার বাঁ কাঁধ দিয়ে। ...

''সমস্ত রক্ত কণিকা দিয়ে শোনে পার্থ অরণ্য প্রান্তের সে শিক্ষার প্রতিধ্বনি। স্নিগ্ধ একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে অধর প্রান্তে। সঙ্গে সঙ্গে আরও খানিকটা রক্ত বেরিয়ে আসে ক্ষত দিয়ে।''[২১]

পার্থর মৃত্যু লড়াইকে দেয় একটি নতুন অভিমুখ। সন্ধ্যা হতে না হতেই হাজার হাজার ডালু, কোচ, গারো, বানাই প্রত্যেকের হাতে তীর – ধনুক, লাঠি, সড়কি, বর্শা। দুর্ধর্ষ তাতার বাহিনীর মতো অন্ধকারে শালবনের ভেতর দিয়ে ছুটে আসে মশালের পর মশাল। মাদলের গুরু গুরু আওয়াজ আর মশালের গণনাতীত সংখ্যা দেখে ভয় পেয়ে যায় মিলিটারি সশস্ত্র বাহিনী। সৈন্যের ঘাঁটি তুলে নিয়ে যাওয়ার হুকুম আসে ওপরওয়ালার। এরপর ভদ্রা পার্থর অসমাপ্ত আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পুনরায় উদ্দীপিত করতে চেয়েছে গারো পাহাড়ের আদিবাসীদের। ''মায়েরা, বধূরা, বোনেরা তোমাদের শান্তির ঘুম কেড়ে নিয়েছে যারা, তাদের পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করার শপথ নিয়ে তোমাদের সন্তানদের, স্বামীদের, ভাইদের পাশে এসে দাঁড়াও। তোমাদের দোলনা দোলানো হাতে বর্শা তুলে নাও।''[২২] এই লড়াই আর

প্রতিবাদের পথই যে অধিকার অর্জনের একমাত্র পথ, সাবিত্রী রায় 'পাকা ধানের গান' উপন্যাসের এই সুবিশাল পরিসরে তাকেই শাশ্বত করে রেখেছেন।

৪. বন্দোবস্তি : মহাশ্বেতা দেবী

মহাশ্বেতা দেবীর 'বন্দোবস্তি' (১৯৮৭ খ্রি:) তেভাগা আন্দোলনকে নিয়ে লেখা একটি উপন্যাস। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কাহিনি এই উপন্যাসে নেই। 'তেভাগা' – র স্মৃতির মধ্য দিয়ে বর্তমান ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার স্বরূপ উন্মোচনের পাশাপাশি এক ব্যক্তির আত্মানুসন্ধানের কাহিনিও হয়ে ওঠে এই উপন্যাস। মধ্যবিত্ত মানুষ তার সুস্থিত জীবনবোধে আপাত শান্তির সন্ধান করে চলেছে। ফলে সে একটা আপোস বা 'বন্দোবস্তি' – র মধ্য দিয়েই নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে চায়। এই কাহিনি যাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে সেই সোমনাথ দত্ত বা সোম এক চল্লিশ অনুত্তীর্ণ যুবক। ১৯৫০ সালে, সোমের তিন বছর বয়সে যখন তার কমিউনিস্ট বাবা অশোকবরণের মৃত্যু হয় তখন রাজনীতি বর্তমান সময়ের মতো কোনো লাভজনক পেশা হয়ে ওঠেনি। সংসারের প্রতি উদাসীন স্বামীর প্রতি একধরণের বিতৃষ্ণা বা ক্ষোভ সোমের মাকে রাজনীতি সম্পর্কে বীতস্পৃহ করে তোলে এবং সোমকেও রাজনীতির নিরাপত্তাহীনতা থেকে সরিয়ে এনে লেখাপড়া ভালো চাকরীর নিরাপদ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তিনি উদ্যোগী হন। ফলে সোম নিজের অতীত এবং বর্তমান কোনো সময়ের সঙ্গেই পরিচিত হয় না। অথচ সোম শুধুই নিশ্চিন্ত জীবিকা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চায়নি। সে বারবার জীবনের কোনো মহৎ উদ্দেশ্যকে সন্ধান করতে চেয়েছে।

এই অনুসন্ধানেই সে বেছে নিয়েছে আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানের হয়ে সমীক্ষার কাজ। মায়ের সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা সোমের বাস্তব বিচ্ছিন্ন জীবন প্রথম ধাক্কা খেয়েছে ভারত – ভুটান সীমান্তে, জলপাইগুড়ির টোটো বস্তিতে। সংরক্ষিত টোটো উপজাতিদের যোজনার বরাদ্দ টাকা ও তাদের নামে রেকর্ডেড জমি কিভাবে সরকারি আনুকূল্যে নয় – ছয় হচ্ছে তা সোম দেখে।

স্বাধীনতার এত বছর পরেও মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী অধ্যুষিত গাড়িয়াতে গিয়ে দেখে রাষ্ট্রীয় বন্দোবস্তিতে আদিবাসীদের আনাহারে মৃত্যু, বাধ্য হয়ে বাবা–মা–র সন্তান বিক্রি, ফসল হস্তগত করে নেয় মহাজন। আদিবাসীরা বাধ্য হয় বুনো অখাদ্য কন্দ খেতে। অথচ ব্লক অফিসারের বাড়িতে পাঁচ কিলো ঘি ঢেলে যজ্ঞ হয়। স্ত্রী জয়িও তাকে সতর্ক করে এবং মধ্যবিত্ত সুলভ বন্দোবস্তিতে নিয়োজিত হতে বলে। কাজকে শুধুমাত্র পেশাদারী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে বলে। হৃদয় দিয়ে নয় মস্তিষ্ক দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বলে। জয়ির সঙ্গে এই কৃত্রিম সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে পারে না সোম।

এই সময়েই সোমের সঙ্গে আলাপ হয় বাবার সহকর্মী রাম সেনের। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য আজ তারই দলের ক্ষমতাসীন শাসকনেতাদের প্রাচুর্যে স্তম্ভিত হয়ে যান। তবে তিনি বিশ্বাস করেন – "টাইমে সকলি চেঞ্জ কইরা গিছে, তাই মনে করি। করুক। আবার চেঞ্জ আইব, ইতিহাসের সত্য।"[২৩] তিনি সোমকে বাম আন্দোলনের প্রকৃত সহায়ক লোককবি ও গণ কবিয়ালদের অবদান নিয়ে কাজ করতে বলেন। রাম সেনের নির্দেশে সোম যায় চব্বিশ পরগণার বনগাঁ মহকুমার ভিতরগাছি গ্রামে ভোলানাথ দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তেভাগা আন্দোলনের মেদিনীপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ভোলানাথ বলেন ১৯৪৪ সাল থেকে কৃষক আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে লোকশিল্পীদের সহযোগিতায় কৃষ্টিবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। বামপন্থী আন্দোলনেরই অবদান গণসংগীত, এই ভ্রান্ত ধারণা ভেঙে ভোলানাথ দেখান গণসঙ্গীতের ঐতিহ্য কত প্রাচীন। শ্বেতাঙ্গ শাসকদের বিরুদ্ধে সাঁওতাল বিদ্রোহ থেকে উত্তর ঔপনিবেশিক কৃষকদের সংকট ও কৃষক নেতাদের নিয়ে মুখে মুখে গড়ে ওঠা গানই প্রকৃত গণসংগীত। বর্তমানের শহুরে কৃত্রিম গণসংগীত থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। চল্লিশের দশকের বামপন্থী নেতারা স্বতঃস্ফূর্ত নাচ, গান, জননাট্যকে ব্যবহার করেছিলেন অথচ ভোলানাথের আক্ষেপ লোকজ সংস্কৃতির এই ব্যাপক সম্ভাবনাকে ফলপ্রসূ করা যায়নি। গ্রামের গান, গাথা, পালাগান, পটশিল্প প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রামের সংস্কৃতির যে প্রসার তেভাগার সংগ্রামকে জড়িয়ে গড়ে উঠতে পারতো অথচ পার্টি নেতৃত্বের উদাসীনতায়

যা শেষ অবধি সম্পূর্ণতা পায়নি। ক্ষমতার অনুপ্রবেশ পার্টিকে তার পূর্বতন ঐতিহ্যের ধারা থেকে বিচ্যুত করে সস্তা মনোরঞ্জনের অপসংস্কৃতিকেই ছড়িয়ে দিয়েছে।

ভোলানাথের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে সোম সন্ধান পায় গণ – কবিয়াল রামলাল খাটুয়ার। পরাধীন ভারতের লবণ আন্দোলনই হোক বা স্বাধীনতা উত্তর কৃষকদের বিরুদ্ধে সরকারী ও জমিদারী অত্যাচার সবই উঠে এসেছে তাঁর গানের কথায় –

"বিদেশী শাসন গেল স্বাধীন শাসন এল

তবু দেখ তোমার সন্তান উপবাসে মরে!"

ভারত ছাড়ো আন্দোলন কিংবা তেভাগা সব আন্দোলনের কথাই তিনি গানের আকারে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। ভোলানাথ চেয়েছিলেন তার গানকে সংকলিত করতে। তেভাগার গানের পাণ্ডুলিপি রামলাল ভোলানাথের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সেই গানের সংকলনের বই প্রকাশ করেন ভোলানাথ। সোমের হাত দিয়ে সেই বই তিনি পাঠাতে চান রামলালের কাছে।

সোম শেষপর্যন্ত রওনা দেয় রামলালের কাছে কিংবা তার শিকড়েরও সন্ধানে। রামলালের সন্ধানে সে যায় খড়্গপুরের বেলদার প্রত্যন্ত গ্রাম মগনাদিতে, গজানন বেরার কাছে। গ্রামীন দারিদ্র্যের ভয়াবহ চিত্র তার শহুরে বোধে অবিশ্বাস্য লাগে। অবশেষে রামলাল খাটুয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। গানের বই তুলে দেয় তাঁর হাতে। ওরা একসাথে গ্রামের মাটির পথ ধরে চলে ধামসা মাদল নিয়ে। সোম অনুভব করে গ্রামীন মুন্ডাদের সরল জীবন, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও আন্তরিক ব্যবহারে নিশ্চিন্ত হয় "ওরা জড়াজড়ি করে নামে। রামলাল, কালীপদ ওরা সোমকে শক্ত করে ধরে রাখে, তার কোনো দরকার নেই, কেননা সোম এখন এরকম পাড়ে উঠতে, ঘাসের ঢাল বেয়ে নামতে নিজেই পারবে। চটি খুলে নেয় ও। এসব ঘাস মাটি, এসব এখন বন্দোবস্তির বাইরে, খালি পা ঘাসে ডোবাও, জানতে পারবে। মাটিতে পা রেখে চলো। হারিয়ে যাওয়া নিজেকেও একটু একটু করে কণায় কণায় ফিরে পাবে।"[২৪]

নতুন করে বাঁচতে চায় সোম। এই সহজ নির্মল মানুষগুলোর মধ্যে নিজেকেই নতুন করে চিনতে চায়। এই উপন্যাসটির রচনা কৌশলে আধুনিক ব্যক্তি মানুষের আত্মিক সংকট উপস্থিত হলেও পাশাপাশি তেভাগার লড়াই, প্রতিরোধ ও আত্মবলিদানের ইতিহাস শাশ্বত হয়ে আছে। ইতিহাসের শুষ্ক পাতায় কোনো আন্দোলনই বেঁচে থাকতে পারে না। তাকে প্রবাহিত হতে হবে জাতীয় চেতনার মধ্য দিয়ে। আর লোকসংস্কৃতি আমাদের সেই চেতনার ফসল। কোনো বন্দোবস্তিই তাকে নস্যাৎ করতে পারে না। কারণ এই সংস্কৃতিই আমাদের অস্তিত্ব। একে ভুলে থাকা মানে নিজের পরিচয়কেই ভুলে যাওয়া।

৫. স্বজনভূমি : ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়

'বাংলা কথাসাহিত্যে আশির দশক আর একটি তরঙ্গের রূপ সামনে আনে, আর একটি পর্বের মুখবন্ধ রচনা করে। সেই Continued process-এর সূত্রেই পঞ্চাশের দশকের স্ট্যালিনের মৃত্যুঘটনায় সাম্যবাদী আন্দোলনে ভাঙন সম্ভব অস্বস্তিকর অবস্থার উদ্ভব, ভারত – চীন সংঘর্ষ, উত্তাল খাদ্য আন্দোলন, ভারত – পাকিস্তান যুদ্ধ, সাম্যবাদী মতাদর্শে প্রবল বিরোধ পিছনে রাখতে রাখতে আসে সত্তর দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলন, জরুরী অবস্থা ঘোষণা, কংগ্রেসী সরকারের পতন এবং নতুন যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতা দখল – এসবই এসময়ে তরুণ ও কিশোর কথাকারদের মনোভূমি এক নতুন স্বাদে ও মাত্রায় নির্মাণ করে। আসে আশির দশক।'[২৫] স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় আশির দশকের যারা বাংলা কথাসাহিত্যিক তারা কেউই পঞ্চাশ – ষাটের দশক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাহিত্য নির্মান করেননি। সাহিত্য রচনায় পূর্বতন ঐতিহ্যের স্বীকৃতি থেকেই যায়। ফলত এই দশকের কথাসাহিত্যিকরা লেখার রীতি, ভাষা কৌশল, বিষয়গত বৈচিত্র্য নিয়ে নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় যেমন দিয়েছেন তেমনি ফেলে আসা সময়কেও নতুন জীবনদর্শনের দ্বারা সন্ধান করতে চেয়েছেন। এই পর্বের তেমনি একজন শক্তিশালী লেখক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। তেভাগা আন্দোলনকে তিনি

সাম্প্রতিক সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে সন্ধান করতে চেয়েছেন 'স্বজনভূমি' (১৯৯৪ খ্রি:) উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। এই উপন্যাসটির জন্য তিনি ১৯৯৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'তারাশঙ্কর পুরস্কার' ও পান। জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর নিবিড় এবং পর্যবেক্ষণ শক্তি প্রগাঢ়। দক্ষিণবঙ্গের গ্রামাঞ্চল তাঁর রচনায় বারবার ফিরে আসে। এই উপন্যাসটির প্রতিটি অবয়ব জুড়ে ছড়িয়ে আছে এক দীর্ঘশ্বাস। ঘটে যাওয়া তেভাগা আন্দোলনের স্মৃতি আজকের দিনে প্রতিমুহূর্তে তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলছে, তার যন্ত্রণা তীব্র এক বেদনার অনুভূতি সৃষ্টি করেছে এই উপন্যাসে। ঔপন্যাসিক কাকদ্বীপ অঞ্চলের তেভাগা আন্দোলনের কথা, সংগ্রামী কৃষক নেতা অতুল কামিল্যার স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। "কংসারী হালদার, কলকাতা থেকে আসা অশোক বোস, দক্ষিণের প্রভাস রায়দের সঙ্গে এদেশের মন্মথ ঘোড়ুই, জগন্নাথ মাইতিদের সঙ্গে গাঙ সাঁতরে যেতে হতো ওপাড়ের গোপন আস্তানায়।"[২৬] দক্ষিণবঙ্গের কাকদ্বীপ, সোনারপুর ও ভাঙরের লক্ষ লক্ষ বর্গা চাষী ও ক্ষেতমজুর রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালিয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে। লাটদার আর ইংরেজ শাসকদের যৌথ অত্যাচারে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে নেতৃত্বকে। কামিল্যার এই আন্দোলন গ্রামের পুরোনো সাধারণ মানুষের কাছে আজও স্মরণীয়। গ্রামের মানুষকে সংগঠিত করে পুলিশের আক্রমণের বিরুদ্ধে যে সংগঠন তৈরি হয়েছিল লালঝান্ডা নিয়ে কৃষকেরা যে লড়াই করেছিল তার কথা আজও শোনা যায়। এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র কুড়ালী তাই বলে– "মামা বাউয় তুমি সে বাংলা তেরশ তিপান্ন সালের আন্দোলনের নেতা লোক। পুলিশের তাম্বু পুড়ানো কমনিস্ট।"[২৭] কিন্তু সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রজন্মের কাছে এই আন্দোলনের গৌরব অস্তমিত। সময় বদলে যায় 'স্বজনভূমি' পাল্টে যায়। সস্তা মনোরঞ্জনের অবাধ প্রবেশ, সহজেই অসৎ পথে রোজগারের প্রবণতা , আধুনিক জীবনের আবিলতা কোথায় যেন সেই লড়াইয়ের গল্পকে ম্লান করে দেয়। তাই সংগ্রামী অতুল কামিল্যার পুত্রবধূ এখন পঞ্চায়েত সদস্যের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক নির্মাণের মধ্য দিয়ে জমির মালিক হতে চায়। যে জমির আর ফসলের অধিকারের জন্য এত লড়াই তার পরিণতি আমাদের এক চরম বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। সরকারি শীলমোহরে আজ

জমির অবৈধ লেনদেন হয়। মজুতদার, কালোবাজারি, বাজার দরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি আজ সরকারি পৃষ্ঠপোষণায় হয়।

'স্বজনভূমি' – র অন্য একটি চরিত্র দেবেনের বাবা গজেন সম্পর্কে আমরা জানতে পারি– "বাপ এককালে জোতদার লাটদার খতম করছ্যে, ফসলের তিনভাগা লিয়ে আন্দোলন করেছিলো। জমি জোতদারের হউক আর লাটদারের হউক, ফসলের দু-ভাগ চাষির। এই লিয়ে কম লোক খতম হইছ্যে? কত কাছারি পুড়াইছে ওর বাপটা। তবুও বাপের কথা উঠলে কী গর্ব ...দেমাক! বড় গলায় কয়, বাপ কাকারা অমন মুভমেন্ট করেছিলো বলেই না আজ দেশময় সৌ আইন করেছ্যে দেশের গরমিন্ট।"[২৮] কিন্তু সত্যিই কি সেই সংগ্রামের কোনো মূল্য আজ আছে? দেবেন উপলব্ধি করে যে লড়াইটা ছিল, আজ পড়ে রয়েছে তার ভগ্নাবশেষ। তাই আজ এই চন্দন পিঁড়ির অহল্যা দাসীকে অনেকেই ভুলে গেছে। নতুন প্রজন্মের কাছে এই লড়াইয়ের কাহিনির কোনো মূল্যই নেই। তাই অহল্যা দাসীর মৃত্যুদিনে স্মরণসভার আয়োজন করা হলেও অহল্যার নাতনি অঞ্জলির কাছেও তার ঠাকুমার বলিদানের ইতিহাস জানা নেই। সে বাবা রতিকান্তকে প্রশ্ন করে 'ঠাক্‌মা ওই গুলিগালাজ বন্দুকের সামনে গেল কেনি? ঘরে থাকলেই তো পারিত? তেরো–চোদ্দ বছরের মেয়েটার সামনে কেমন বোবা মেরে যায় রতিকান্ত। সত্যি তো মা কেনি গেছিল? শুধু কি মা একলা গেছিল? আরও কত মানুষ যে এগিয়েছিল। কাদের কথায়। কাদের উপদেশ ...কারাই বা সে মানুষগুলান!'[২৯] এর কোনো উত্তর আজ আর নেই। এই মানুষগুলির জন্য শহীদবেদী হয়েছিল। কিন্তু শহীদবেদী উত্তর প্রজন্মের কাছে পরিচয়হীনতার আবরণে ঢেকে গেছে। সংশয়াচ্ছন্ন নিতাই যার বাবা ভূপতি তেভাগার জন্য অস্ত্র লুকিয়ে রাখতে গিয়ে অস্ত্র বিস্ফোরণের ফলে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিল সে নিজের মনেই ভাবে 'বাপ খুড়াদের কাণ্ডকাহিনি অখন ছেলেমেয়েরা জানেঠে কাঁই ...! তখন তো অতোগুলান মা – বোন জীবন দিলে এই দ্বীপের মানুষের ভালো করিবার আশায় দ্বীপ ছাড়িয়ে বিদেশের চাষামজুরদের মঙ্গল কামনায়...। নাকি অখনকার বাপ – ভাইরা সোউ কথা

মুখেই আনেনি! গল্প কয়নি ! যারা কয় ...তারা কি শুধু সংগ্রাম সংঘর্ষকারী বংশের লোকজন, ছেলেপুলেরা? তা হইলে কি এই সংগ্রাম – আন্দোলন সকলের মঙ্গলের হইয়া উঠছে নি! নাকি এই সংগ্রাম ... ইতিহস সকলকে লইয়া নয়...নাকি বাদসাধ কেউ থাউকবেই...! কিছু লোক মেনে লিবেনি।'[৩০] আন্দোলনের গরিমার প্রতি সাধারণ মানুষের এই অবজ্ঞা, অজ্ঞানতা আহত করে নিতাইকে। এর দায় কার? এ প্রশ্নের উত্তর অমীমাংসিতই থেকে যায়। নতুন সরকারি নীতি কিংবা দুর্নীতি আজ আর সেইদিনের লড়াকু মানুষগুলির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে না। তাই সরকারি নির্দেশে ফ্রিডম ফাইটাররা সাড়ে সাতশো টাকা করে পেনশন পেলেও তেভাগা – র বীর সংগ্রামীরা পান মাসিক তিনশত টাকা। এই ব্যবধানের কারণ অজ্ঞাত । কামিল্যার ছেলে এই নিয়ে হতাশা প্রকাশ করলে ধমকে ওঠে অতুল কামিল্যা। ছেলেটাকে তাঁর নিজের ছেলে মনে হয় না। মনে হয় কোন জোতদারের ছেলে। তাঁর এতদিনকার একটু একটু করে গড়ে ওঠা অতীতের সুখস্মৃতি থেকে তাঁকে যেন বিযুক্ত করে দিচ্ছে। 'স্বজনভূমি'–র জন্য তাঁর আত্মত্যাগের মূল্য নির্ধারিত হতে পারে না সরকারি নীতির দ্বারা। লড়াইটা একদিন হয়েছিল সে সত্য মিথ্যা হতে পারে না। সেই লড়াইয়ের প্রতিটি অনুভবই এখন বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন।

তেভাগা আন্দোলন অবিভক্ত বাংলার শেষ সবথেকে বড় কৃষক আন্দোলন। স্বাভাবিকভাবেই তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বর্তমান বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরাও উপন্যাস রচনা করেছেন। আমাদের আলোচনার সূত্রে আমরা তিনটি উপন্যাসকে নিয়ে এখানে আলোচনা করব। দুটি উপন্যাসের রচয়িতা সেলিনা হোসেন এবং একটি উপন্যাসের রচয়িতা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর সবক্ষেত্রেই নতুন জোয়ার আসা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। সাহিত্যচর্চাতেও দৃষ্টিভঙ্গী ও মননশীলতার পরিবর্তন ঘটেছিল। এই সময়ের একজন বিশিষ্ট

ঔপন্যাসিক হলেন সেলিনা হোসেন। তাঁর যে দুটি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করব তার প্রথমটি হল 'কাঁটাতারে প্রজাপতি' (১৯৮৯ খ্রি:) এবং দ্বিতীয়টি হল 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' (১৯৯৪ খ্রি:)।

৬. কাঁটাতারে প্রজাপতি : সেলিনা হোসেন

নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের কিংবদন্তি নারী ইলা মিত্র। এই ইলা মিত্রের জীবনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে সেলিনা হোসেনের উপন্যাস 'কাঁটাতারে প্রজাপতি'। "তেভাগার দাবিতে উত্তরবঙ্গ জুড়ে আন্দোলন যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল (১৯৪৬-৪৮) , সেই সময় রাজশাহীর নাচোলে তেভাগার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৭ থেকে রাজশাহীর নবাবগঞ্জ ও নাচোলে তেভাগার দাবিতে সাঁওতাল , হিন্দু ও মুসলমান ভাগচাষিদের আন্দোলন তীব্র বিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল। এই আন্দোলনে বহু সংগঠক ও কর্মী অসীম সাহস ও আন্তরিকতা নিয়ে যোগ দিয়ে আত্মদান করেছিলেন।"[৩১]

এই আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ইলা মিত্র। তিনি তেভাগা আন্দোলনে নাচোলের নারীদের সংগঠিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের রামচন্দ্রপুর এলাকার কমিউনিস্ট নেতা রমেন মিত্রের স্ত্রী এবং নিজেও ছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এসে স্বামীর সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে নাচোলের কৃষক আন্দোলনের কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জীবনভিত্তিক কাহিনিকেই সেলিনা তাঁর উপন্যাসের বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন। উপন্যাস শুধু বাস্তব কাহিনির শুষ্ক রূপায়ণ নয়। তার সঙ্গে মিশে থাকে কল্পনার সুবাস। সেলিনা ইতিহাস ঘটনা আর কল্পনার সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। অগ্নিগর্ভ নাচোলের সংগ্রামের ইতিহাসের প্রতি তিনি যেমন দায়বদ্ধ

থেকেছেন তেমনি নানা কল্পিত চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে কাহিনিটিকে একটি অন্য মাত্রা দান করতে সক্ষম হয়েছেন।

উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে ইলা মিত্র রমেন মিত্রের বিয়ে এবং নানা ঘটনাচক্রের উপস্থাপনা করা হয়েছে। নবম অধ্যায় থেকেই ইলা মিত্র রামচন্দ্রপুরে মেয়েদের স্কুল তৈরি করে তাঁর কর্মকান্ডের জগতে প্রবেশ করেছেন। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে কৃষকদের জন্য কমিশনের সুপারিশ এবং কৃষকসভার কর্মকাণ্ডের কথাকে লেখিকা ইলা মিত্রের ভাষণের খসড়া তৈরি করার মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। ঐতিহাসিক তথ্যের বর্ণনা ঔপন্যাসিক কাঠামোয় তিনি দক্ষতার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। এই উপন্যাসে এসেছে ১৯৪৬ সালের ১৬ ই আগস্টের ভয়াবহ দাঙ্গা প্রসঙ্গ, ভারতের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লিগের জয়লাভ, সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভ, নোয়াখালির দাঙ্গা, গান্ধীজীর নোয়াখালি সফর, ইলা – রমেনের নোয়াখালি গমন এরই মাঝে ১৯৪৭ সালের ২০ শে ফ্রেব্রুয়ারি ব্রিটিশরাজের ভারত ছেড়ে যাওয়ার ঘোষণা ইত্যাদি ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে। ১৪ ই আগস্ট পাকিস্তান নামে নতুন একটি রাষ্ট্রের জন্ম হল। মালদহ জেলার পাঁচটি থানা – চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, শিবগঞ্জ, নাচোল ও গোমস্তাপুর রাজশাহী জেলার সাথে যুক্ত হয়। মুসলমান দেশে হিন্দুরা বসবাস করতে পারবে কিনা এই দ্বন্দ্ব চলতে শুরু করে। এর মধ্যেই রমেন মিত্রের মা বিশ্বমায়া মিত্র এদেশে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্ত থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হওয়ায় হিন্দু সম্প্রদায়ের যে মানসিক সংশয় ও সংকট ঔপন্যাসিক সেটিকে দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন।

“ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৮ সালে। সেই সম্মেলনে বা কংগ্রেসে পার্টির নেতা রণদীভের তত্ত্ব এবং নির্দেশিত সিদ্ধান্ত ছিল যে , ভারত উপমহাদেশে বিপ্লব ঘটবেই, সেজন্য সশস্ত্র তৎপরতার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই নির্দেশিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কার্যক্রম চালানোর প্রেক্ষাপটে নাচোলে

তেভাগা আন্দোলনের সূত্রপাত এবং হঠকারীভাবে, অপ্রস্তুত পদ্ধতিতে নাচোলে কৃষক বিপ্লব ও পুলিশ–কৃষক সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছিল ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে।"[৩২] রমেন মিত্র রনদীভের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানান এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নাচোলে তেভাগার সিদ্ধান্ত নেন। উপন্যাসে আমরা লক্ষ্য করি কৃষকরা ধান কেটে সাঁওতাল নেতা মাতলার বাড়িতে জমা করে তারপর ভাগ করে জোতদারদের ধান নেওয়ার জন্য খবর দেওয়া হয়। যারা নিতে আসে তাদের দেওয়া হয় আর যারা উপস্থিত হয় না তাদের ভাগ গোরুর গাড়ি করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জোতদাররা এটা মেনে নিতে পারেন না। থানায় ধান লুঠের অভিযোগ জানানো হয়। এতে পুলিসি তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৮ সালের ৬ –ই মার্চ ইলা মিত্র – রমেন মিত্রের একমাত্র সন্তান মোহনের জন্ম হয় কলকাতায়। সন্তান জন্মের পর তিনি আবার ফিরে এসে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে চলে যান সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকায়। সাঁওতালদের উদ্দীপিত করেন এবং তাদের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে হয়ে ওঠেন তাদের প্রিয় রাণিমা। কৃষক ও সাঁওতালদের যৌথ উদ্যোগে ধান কাটা শুরু হলেই পুলিসের উপস্থিতির খবর পাওয়া যায়। জানা যায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকজন কৃষককে পুলিস আটকে রেখেছে। তাদের ছাড়িয়ে আনার জন্য হাজার হাজার নারী পুরুষ জড়ো হয়। লিগ সরকারের পুলিস ও সেনাবাহিনী সাত – আটটি গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। হত্যা,লুঠ,ধর্ষণের মধ্য দিয়ে অমানবিক অত্যাচার চলে। ইলা মিত্র রোহনপুর স্টেশনে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে যান। এরপর শুরু হয় দীর্ঘ নির্যাতনের বীভৎস কাহিনি। এই উপন্যাসটি শেষ হয় ইলা মিত্রের যে জবানবন্দি পার্টি ইশতেহার আকারে প্রকাশিত হয়েছিল তা পাঠের মধ্য দিয়ে। সমস্ত পৃথিবী তাঁর উপর ঘটে যাওয়া নৃশংস অত্যাচারের কাহিনি জেনেছিল এই জবানবন্দির মাধ্যমেই।

এই উপন্যাসে ইলা মিত্রের সংগ্রামী জীবন অত্যন্ত যত্নের সাথে চিত্রিত হয়েছে। ঘটনা পরম্পরাকেও সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। শোষিত নিগৃহীত কৃষকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের

প্রশ্নে এই অসীম সাহসী নারীর সর্বস্বপণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ার কাহিনিকেই সেলিনা হোসেন বিবৃত করেছেন ঐতিহাসিক সত্য ও সাহিত্যিক সত্যের সার্থক মেলবন্ধনে।

৭. গায়ত্রী সন্ধ্যা : সেলিনা হোসেন

১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সেলিনা হোসেনের 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' ত্রয়ী উপন্যাসের প্রথম খন্ডে তেভাগা প্রসঙ্গ হিসেবে এসেছে । ঔপন্যাসিক গ্রন্থের ভূমিকাতে উল্লেখ করেছেন গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ব্যাপ্তি ১৯৪৭ – ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ দেশবিভাগের পরবর্তী সময়ে সদ্যসৃষ্ট পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক রাজনৈতিক উত্তাল পরিস্থিতিকে তিনি তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। ভারতের দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির ফলশ্রুতিতে যে দেশবিভাগের পরিণাম ছিল তাতে আমরা পেয়েছি অত্যাচার, নির্যাতন, বাস্তুচ্যুতি, সীমান্ত সন্ত্রাস, দেশত্যাগ, উদ্বাস্তু, শরনার্থী শিবির, প্রাণহানি, সম্মানহানির যন্ত্রণায় দগ্ধ সাধারণ মানুষের জীবন। স্বাভাবিকভাবেই এই শারীরিক ও মানসিক ক্ষয় প্রতিমুহূর্তে দগ্ধ করেছে নিজের অস্তিত্বকে। সেলিনা এই ভাবনাটিকেই ধরতে চেয়েছেন। কাহিনির সূত্রপাত ঘটছে দেশবিভাগের পর ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হওয়া মুর্শিদাবাদের রাঙামাটি গ্রাম ছেড়ে রাজশাহীতে আশ্রয় নেওয়ার উদ্দেশ্যে মহানন্দা পার হতে থাকা কয়েকটি বিপর্যস্ত পরিবারের বর্ণনা দিয়ে। পুষ্পিতা আর আলী আহমদ ভারত থেকে নতুন রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে। সন্তান সম্ভবা পুষ্পিতার ট্রেনের মধ্যেই দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হয়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে পুত্রের নাম রাখা হয় প্রতীক। ধর্মের ভিত্তিতে দুটি রাষ্ট্রের জন্মের রাজনৈতিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল পরাধীন ভারতবর্ষে দীর্ঘ তিনদশক ধরে। যাতে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষকে মুহূর্তে সংখ্যাগুরু কিংবা সংখ্যালঘু অভিধায় ভূষিত করা যায়। মানুষের জীবনের এই চরম ক্ষতকে সারিয়ে তোলা যায় না। উদ্বাস্তু হওয়ার যন্ত্রণার সঙ্গে যে অবজ্ঞা মিশে থাকে তার কোনো প্রতিষেধক হয় না। ফজলে গাজী, তার মা, হেডমাস্টার নসরুল্লাহ, তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলে মফিজুল ও

তরিকুল তারাও ভারত ছেড়েছে। নসরুল্লাহ নাচোলে এসে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি পান আর আলী আহমেদের রাজশাহী কলেজে বাংলা বিভাগে হিন্দু অধ্যাপকের ছেড়ে যাওয়া শূন্যপদে নিয়োগ হয়। বারবার তাঁর মনে হয় 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়'। নসরুল্লাহর বড় ছেলে মফিজুল আলী আহমেদের সহযোগিতায় রাজশাহী কলেজে ভর্তি হয় এবং ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে।

এই সময়ই নাচোলে তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়। ইলা মিত্র ও রমেন মিত্রের সহযোগিতায় নসরুল্লাহ, ফজলে গাজী এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। জোতদার ওসমান গণি যে সম্পর্কে নসরুল্লাহ – র ভাই সে তেভাগার এই উত্তাল দাবিকে মেনে নিতে পারে না। স্বাভাবিক ভাবেই বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় পূর্ব পাকিস্তানে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্ত। এই চাপিয়ে দেওয়া রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে রাজশাহী কলেজের ছাত্ররা মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে গিয়ে মুসলিম লিগের দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হন। কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজশাহী জেলে তাদের আটক করা হয়। রাজশাহী শহরে ছড়িয়ে দেওয়া হয় দাঙ্গার গুজব। এই সুযোগে ভয় দেখানোর রাজনীতিতে হিন্দুদের সম্পত্তি জলের দরে বিক্রি হয়ে যায়। অনেক হিন্দুই সমস্ত কিছু ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

রমেন মিত্রের দ্বারা চালু করা তেভাগাকে বন্ধ করার জন্য পুলিস ও সেনাবাহিনী তৎপর হয়ে ওঠে। সাঁওতাল ও কৃষকদের প্রতিরোধে চারজন পুলিস নিহত হয়। প্রতিশোধ নিতে সেনাবাহিনী নির্বিচারে গুলি চালায়। গুলিতে ফজলে গাজী নিহত হয়। রোহনপুর স্টেশনে ইলা মিত্র ধরা পড়ে যান। ইলা মিত্র সাঁওতালের ছদ্মবেশে ছিলেন। তাঁকে সনাক্ত করার জন্য নসরুল্লাহ মাস্টারকে ডাকা হয়। কিন্তু তিনি তাঁকে চেনেন না বলে জানান। ইলা মিত্র এবং সাঁওতালদের উপর অকথ্য পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়। ইলা মিত্রের বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

উপন্যাসের এই পর্যায়ে মূলত রাষ্ট্রভাষাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ যে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই বৃত্তান্ত ব্যক্ত হয়েছে। উপন্যাসের পরবর্তী অংশে ইলা মিত্র প্রসঙ্গ আবার এসেছে। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতির কারণে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে আনা হয়। আলী আহমেদ তাঁকে দেখতে যান। এখান থেকে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে কলকাতায় চলে যান ইলা মিত্র। এই অংশে ভাষা আন্দোলন যেহেতু গুরুত্ব পেয়েছে, তাই ইলা মিত্র প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হয়েছে। প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হয়েছে মার্শাল ল' জারির প্রসঙ্গ দিয়ে।

সেলিনা হোসেন 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে মূলত ভাষা আন্দোলনকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। ইলা মিত্র ও তেভাগা প্রসঙ্গ কালানুক্রমিক ইতিহাসের পারম্পর্যকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করার লক্ষ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। তিন খণ্ডে সমাপ্ত এই উপন্যাসে সেলিনা–র মূল লক্ষ্য দেশবিভাগের পর পূর্ব–পাকিস্তানের মানুষের জীবনে ও সংস্কৃতিতে ভাষাকে কেন্দ্র করে যে অস্তিত্বের লড়াই শুরু হয়েছিল তাঁর বর্ণনা দেওয়া। এই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ নবসৃষ্ট রাষ্ট্রটিকে একটি সূত্রে গাঁথতে চেয়েছিল। পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করেছে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই রাষ্ট্র ও তাঁর স্বাধীন অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তিকে রক্ষা করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিস্তার বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের স্বপ্নকে নস্যাৎ করেছে। দেশবিভাগের যন্ত্রণাকেও বুকে নিয়েও যে মানুষগুলি নতুন একটি রাষ্ট্রের সত্তার সঙ্গে মিশে যেতে চেয়েছিল সেখানেও কিন্তু সৃষ্টি হয়েছিল প্রতিবন্ধকতা। তাই অনেক আত্মবলিদানের মধ্য দিয়েও আত্মিক সংঘাত থেকে মানুষ মুক্ত হতে পারেনি। সেই যন্ত্রণাকেই ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে তাঁর নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণী দক্ষতার দ্বারা নির্মাণ করেছেন।

৮. খোয়াবনামা : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত ছোটগল্প দিয়ে। ১৯৭৬ – ১৯৮৫ সালের মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয় বেশ কতগুলি গল্প তাঁর প্রকাশিত হয়েছিল। 'অন্য ঘরে অন্য স্বর', 'খোঁয়ারি', 'দুধেভাতে উৎপাত' এই গল্পসংকলনগুলি এই সময়সীমার মধ্যেই প্রকাশিত হয়। ১৯৮৬ খ্রীঃ প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চিলেকোঠার সেপাই' এবং দশবছর পর প্রকাশিত হয় 'খোয়াবনামা' (১৯৯৬ খ্রি:)। ইলিয়াস নিঃসন্দেহে একজন ক্ষমতাশালী লেখক। তাঁর 'মতো প্রখরভাবে সচেতন, জাতীয় মনের গভীরে নিমগ্ন এবং আত্মসন্ধানী আগের পর্বের লেখকেরা ছিলেন না। এমন ভূমিসংলগ্নতাও কারো ছিল বলে মনে হয় না। আজ যখন পুব বাংলার শহুরে মধ্যবিত্তের গ্রামের জীবনের সঙ্গে যোগ ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছে, আজ যখন শহুরে মানুষদের দেশের সঙ্গে এই বিচ্ছেদ ক্রমেই আধুনিকতার লক্ষণ বলে গণ্য হচ্ছে, তখন আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দেশের মাটির সঙ্গে সৃজনশীলভাবে সংযোগ স্থাপন ও সংযোগরক্ষা সীমাহীনভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।"[৩৩]

তাঁর অসামান্য মহাকাব্যোপম উপন্যাস 'খোয়াবনামা'–য় এক গভীরতর চেতনাকে ব্যক্ত করেছেন। বাংলাদেশের প্রান্তিক জনপদে বসবাসকারী একটি জনগোষ্ঠীর যাপিত জীবনের খুঁটিনাটি তিনি তুলে ধরেছেন তা তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তির ফল। তিনি নিজেই বলেছেন "দেশের কি জাতির সংস্কৃতির গোড়ায়" যেতে হবে। শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত জীবনের 'স্যাঁতস্যাঁতে দুঃখবেদনাকে' সাহিত্যে তিনি লালন করতে চান না। 'খোয়াবনামা' তাঁর সেই ভাবনারই ফসল। এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু মূলত মানুষের বেঁচে থাকার খোয়াব। কাৎলাহার বিলের ধারে জঙ্গল সাফ করে বসতি গড়ে সোভান ধুমার সুখে থাকার খোয়াব, তমিজের জোতজমির সাথে সাথে তেভাগার খোয়াব, তাঁর বাবার ঘুমের ঘোরে কাৎলাহার বিলের অশরীরী মুনসিকে দেখার খোয়াব, কেরামতের চেরাগ আলি ফকিরের মতো গায়েন হওয়ার খোয়াব–সবই একসময় ভেঙে পড়ে।

খোয়াবনামার শুরু বিলের মালিকানা জমিদারের অধীনে চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। জমিদারি শোষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই এলাকার মানুষ। পাশাপাশি শরাফত মণ্ডল ও কালাম মাঝির মতো নতুন মুসলমান জোতদার শ্রেণি তৈরি হতে থাকে। শোষণের প্রশ্নে তারা জমিদারের থেকে আলাদা নয়। তাই তাদের সাথে বিরোধ তৈরি হয় তমিজ-কেরামতের মতো খেটে খাওয়া মানুষদের। বিল ডাকাতির আসামি হয়ে তমিজ ফেরার হয়েও স্বপ্ন দেখে নিজের জমির। খিয়ার অঞ্চলে গিয়ে তেভাগা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। যদিও প্রথমে তমিজ তেভাগার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। "পশ্চিমে ধান কাটতে গিয়ে আধিয়ার-দের কাণ্ডকারখানা তো তমিজ দেখে এসেছে নিজের চোখেই, এসব দাপাদাপি সে নিজেই কি আর পছন্দ করে? জমি হল জোতদারের, ফসল কে কী পাবে সেটা তো থাকবে মালিকের এক্তিয়ারে। অথচ ফসলের বেশিরভাগ দখল করতে আধিয়াররা নেমে পড়ে হাতিয়ার হাতে।"[৩৪] কিন্তু তার এই সহমর্মিতা ক্রোধে রূপান্তরিত হতে সময় লাগে না। শরাফত মণ্ডল ও তার ছেলে কাদের তমিজকে জমি বর্গা দিতে চায় – এর পিছনে একটি বৃহৎ স্বার্থ লুকিয়ে আছে। কাদের মনে করে তমিজকে জমি দিলে "তমিজটা এখন তার বশেই থাকবে। গিরির ডাঙায় মাঝিদের দাপট এখনও কম নয়। মাঝিদের মধ্যে এই তমিজটাই গোলাবাড়ি গেলে একবার না একবার তার দোকানে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকে , লীগের ছেলেদের কথাবার্তা মন দিয়ে শোনে। একে দিয়েই মাঝিপাড়াটা কাদের নিজের দিকে টানতে পারবে। আবার দলের নেতাদের সামনে সে দাখিল করতে পারবে তমিজকে। এরকম কর্মী এই এলাকায় আর পাওয়া যাবে না। তাছাড়া , এসব মাঝি আর চাষা আর কলুদের মধ্যে ভেদাভেদ রাখলে পাকিস্তানের ডাকে সাড়া দেবে কে?"[৩৫]

মুসলিম লিগের রক্ষণশীল অংশ কমিউনিস্ট এবং তেভাগা বিরোধী ছিল, তারা তমিজের মতো লোকেদের কাছে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। পাকিস্তানে জমিদার মহাজনি থাকবে না। তেভাগা নিয়ে বলেছে, "পাকিস্তান হলে আফসোস করেছে, তাদের কত তেজি তেজি মুসলমান ছেলে পাকিস্তানের ডাকে মুসলিম লীগে

ভিড়ে গেছে। তারা কি এমনি এমনি ভিড়েছিল।”[৩৬] কিন্তু যেদিন ধান ভাগ হয় সেদিন সে বুঝতে পারে কেন খিয়ারের আধিয়াররা দুইভাগ দাবি করে আন্দোলন করেছিল। হালের গরু মই, লাঙল, পানি বাবদ টাকা কেটে রেখে তমিজ যা পায় তাতে তার মুখ ‘কালো’ হয়ে যায়। বিচিত্র রকম বকেয়ার দাবি আর অদ্ভুত ব্যাখ্যা তাঁকে বিস্মিত করে। কিন্তু মেনে না নিয়ে উপায় থাকে না। জোতদার মণ্ডলের সাথে লড়বার সামর্থ্য তার নেই। মণ্ডলের ছোটছেলে যে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখছে সেখানেও কৃষকের মুক্তি নেই। আছে শোষণের হাতবদলের প্রক্রিয়া। তেভাগা আন্দোলন ভেঙে দিতে জোতদার মহাজনরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায়। দুই সম্প্রদায়ের মানুষের ঐক্য নষ্ট করার জন্য একটি ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করা হয়। তমিজ বুঝতে পারে তার জমির খোয়াব কোনদিনই পূরণ হওয়ার নয়। কালাম মাঝির বিলে বিনা খাজনায় মাছ ধরতে গিয়ে যমুনার মাঝিদের সাথে বিরোধে জড়িয়ে একজনকে সড়কির আঘাতে ঘায়েল করে তমিজ। তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। কাদের তাকে ঢাকা শহরে এম.এল.এ ইসমাইল হোসেনের বাড়িতে লুকিয়ে রাখার পরিকল্পনা করে যাতে ভবিষ্যতে সে তমিজকে কালামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে। ঢাকার ট্রেনে তাকে তোলা হয়। সেই ট্রেনের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল শান্তাহারের ট্রেন। তাতে প্রচুর পুলিস ওঠে। কারণ জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে জানতে পারে আধিয়ারদের হাঙ্গামা দমন করতে যাচ্ছে পুলিস। তমিজ ওই ট্রেনে উঠে বসে। তার মনে হয় এখানে একটু চেষ্টা করলে সে বর্গার জমি পাবে। স্থানীয় কৃষকদের বিশ্বাস করে না বলেই জোতদাররা বাইরের কৃষকদের জমি বর্গা দিচ্ছে। এখানে বর্গাদার হয়ে জমি চাষ করলে হাল ফিরে যাবে। আর তেভাগা হয়ে গেলে তাকে আর কে পায়। বন্ধকি ভিটা ছাড়িয়ে নেবে। সেই স্বপ্নপূরণের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তমিজ ছুটতে থাকে ঠাকুর গাঁ, হিলি কিংবা নাচোলে।

স্বচ্ছ ইতিহাসচেতনা, মানবিকবোধ এবং জীবনকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার দক্ষতাই আখতারুজ্জমান ইলিয়াসকে দিয়েছে ‘খোয়াবনামা’ নির্মাণের শক্তি। তেভাগার

ইতিহাসকে অতিক্রম করে এই উপন্যাস আসলে মৃত্তিকা সংলগ্ন প্রান্তিক মানুষগুলির জীবন বৈচিত্র্যের ইতিহাস তাদের দেখা পূর্ণ ও অপূর্ণ সমস্ত খোয়াবেরই বিবরণ।

শেষবিচারে স্বীকার করতেই হবে 'তেভাগা' একটি আংশিক সংগ্রাম; সাধারণ কৃষকদের কাছে কৃষিবিপ্লব তখনও ছিল সুদূর আদর্শ। স্বাভাবিকভাবেই কৃষকদের মধ্যে কিংবা নেতৃত্বের মধ্যেও এই আন্দোলনকে কার্যকরী রূপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো ক্ষমতা ছিল না। কৃষক সভার শক্তি নিহিত ছিল গ্রাম স্তরের কমিটি গুলির মধ্যে। এরাই মূলত কৃষকদের মধ্যে সংযোগ বজায় রেখে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রামীণ কার্যভার সামলেছে এবং তেভাগার লড়াইতে এরাই এগিয়ে এসেছে। শহুরে মধ্যবিত্ত মানুষ এই আন্দোলনের সঙ্গে কখনোই একাত্ম হয়নি। বামপন্থী নেতৃত্বও এ ব্যাপারে সফল হয়নি। "আগস্ট বিপ্লবের' বিপর্যয়ের পর বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের জাতীয় সংগ্রামের কোনো কর্মসূচী ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টিই একমাত্র পার্টি যে 'ক্ষমতার জন্য চূড়ান্ত সংগ্রামের' ডাক দিয়েছিল। কিন্তু 'জাতীয় নেতৃত্বের মাথার উপর দিয়ে' কৃষক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো শক্তি তার ছিল না।"[৩৭] ফলত এই আন্দোলনকে নিয়ে লেখাও হয়েছে খুব কম। বাংলাদেশের সিংহভাগ মধ্যবিত্ত লেখক গোষ্ঠী তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে মানসিক ভাবে সম্পৃক্ত হতে পারেননি। স্বাভাবিক ভাবেই বিশেষত উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা কৃষক নেতৃত্বের ভূমিকা কমই লক্ষ্য করি। কমিউনিস্ট ভাবনাপুষ্ট যুবকরাই এই ধরণের উপন্যাসের মূল চালিকাশক্তি হয়েছেন। তাদের মধ্যবিত্ত মানসিকতাই উপন্যাসের গতিপথ নির্মান করেছে। ব্যতিক্রম আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' উপন্যাসটি যেখানে প্রান্তিক মানুষের চোখ দিয়ে জমি ও ফসলের স্বপ্ন, অধিকারের রাজনীতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'তেভাগা' আন্দোলন নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলি আন্দোলনের পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলনের দিশা নির্মাণে এই উপন্যাসগুলির কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু পরবর্তীকালের সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে 'স্বদেশের মৃত্তিকায় ও বাতাবরণে, স্বদেশীয় অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে তাঁরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ–সমকালীন

সংকটকালকে নবযুগ – চেতনার স্বাক্ষর – শানিত কথাসাহিত্যে রূপায়িত করলেন। আধুনিক পৃথিবীতে উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বাণী এভাবেই ব্যাপ্ত হয়ে যায় দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে। দেশে দেশে শুভবোধসম্পন্ন মানুষের প্রতিরোধ এভাবেই অবিচ্ছিন্ন হয়ে দেখা দেয়। প্রত্যাশা নিয়ে আসে এমন কোনও নতুন প্রভাতের –

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল

আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না –'[৩৮]

উল্লেখপঞ্জি :

১. গৌতম অধিকারী (সম্পা.) : 'কথাসাহিত্যিক গুণময় মান্নার সঙ্গে সাক্ষাৎকার', 'কথারূপ', 'ননী ভৌমিক সংখ্যা–এক', ষষ্ঠ সংকলন, জুলাই, ২০১০, কলকাতা, পৃ.১৯৭।

২. গুণময় মান্না : 'লখীন্দর দিগার', বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রা. লি., ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা – ৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯৫০, দ্বিতীয় সং : ১৯৬৪, পৃ. ১।

৩. তদেব : পৃ. ১৬।

৪. তদেব : পৃ. ২৫।

৫. তদেব : পৃ. ৪৩।

৬. তদেব : পৃ. ৫৭।

৭. তদেব : পৃ. ১১০।

৮. তদেব : পৃ. ১১২।

৯. তদেব : পৃ. ১২৩।

১০. তদেব : পৃ. ১৪৭।

১১. তদেব : পৃ. ১৫২।

১২. তদেব : পৃ. ১৭২।

১৩. তদেব : পৃ. ২০০।

১৪. তদেব : পৃ ১৯৭।

১৫. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'লালমাটি', 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী' (৪র্থ খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা – ৭৩, প্রথম প্রকাশ: ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৭৮।

১৬. তদেব : পৃ. ১৮০।

১৭. তদেব : পৃ. ১৮২।

১৮. সাবিত্রী রায় : 'পাকাধানের গান', 'সাবিত্রী রায় রচনা সমগ্র (২য় খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্টিট,কলকাতা–৭৩, প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ২০০৮, পৃ. ৯৮।

১৯. তদেব : পৃ. ৪৬৬।

২০. তদেব : পৃ. ৪৬৮।

২১. তদেব : পৃ. ৪৭৪।

২২. তদেব : পৃ. ৪৭৮।

২৩. মহাশ্বেতা দেবী : 'বন্দোবস্তি', 'মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র' (খণ্ড ১৫), দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা – ৭৩, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ২০০৪, পৃ. ১৯১।

২৪. তদেব : পৃ. ২২৪।

২৫. বীরেন্দ্র দত্ত : 'বাংলা কথাসাহিত্যের একাল', পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা–৯, প্রথম প্রকাশ: ২০ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮, পৃ. ৩৮০।

২৬. ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় : 'স্বজনভূমি', দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,

কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৯৪, পুনর্মুদ্রণ: জুন, ২০১৬, পৃ. ৬৯।

২৭. তদেব : পৃ. ২৮।

২৮. তদেব : পৃ.১৫।

২৯. তদেব : পৃ.১২২।

৩০. তদেব : পৃ.৯৮।

৩১. মালেকা বেগম : 'ইলা মিত্র নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী', প্রথমা প্রকাশন, সি এ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা, প্রথম প্রথমা সং : অমর একুশে গ্রন্থমেলা, ২০১১, পৃ. ১৭ – ১৮।

৩২. তদেব : পৃ. ১১।

৩৩. সত্যেন্দ্রনাথ রায় : 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা', দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা – ৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৩৫৫।

৩৪. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : 'খোয়াবনামা', নয়া উদ্যোগ, ২০৬, বিধান সরণি, কলকাতা–৬, প্রকাশসাল : এপ্রিল, ১৯৯৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮, পৃ. ৪৩।

৩৫. তদেব : পৃ. ৪৯।

৩৬. তদেব : পৃ. ১২৭।

৩৭. সুনীল সেন : 'বাংলার তেভাগা সংগ্রাম ১৯৪৬ – ৪৭', চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, ৪১এ, ব্যানার্জী পাড়া রোড, কলকাতা– ৪১, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৩, পৃ. ৭৬

৩৮. সুমিতা চক্রবর্তী : 'ছোটগল্পের বিষয়–আশয়', পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথমপ্রকাশ: জুন, ২০০৪, পৃ. ৬৪।